শারদ সংখ্যা ১৪৩১
বই বুটির কলকাতা

:: ভূমিকা ::

"বই কুটির কলকাতা" একটি উন্মুক্ত মঞ্চ। যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৫ই আগস্ট ২০২০ সালের মহামারীর আবহে। এরপর বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে আজ "বই কুটির কলকাতা" তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তাই “বই কুটির কলকাতা” আবারও প্রকাশ হতে চলেছে এক নতুন রূপের আঙ্গিকে। আমাদের প্রচেষ্টা "বই কুটির কলকাতা" তার নিজস্ব গরিমা যেন বজায় রাখতে পারে। মহামারীর সময় ছোট্ট এক ফেসবুক পেজ থেকে শুরু হয় আমাদের এই যাত্রাপথ। সেই সময় অচেনা মানুষদের অপ্রকাশিত ছোট ছোট কবিতা, ছড়া ও অনুভূতি গুলি ছিল আমাদের মূল উপকরণ। প্রায় ২০০ টির বেশি লেখা আমাদের পাঠকদের ভালোবাসা কুড়িয়েছিল দুহাত ভরে। এই আন্তরিক ভালবাসাকে পাথেয় করে "বই কুটির কলকাতা" এগিয়ে যেতে চায় তার নব দিগন্তের জগতের দিকে প্রকাশক রূপে। আপনাদের আশীর্বাদ এবং সহযোগিতা আমাদের কাম্য।

দেখতে দেখতে আমরা প্রকাশ করতে চলেছি আমাদের নবম তম পত্রিকার "শারদ সংখ্যা ১৪৩১"। এটি আমাদের শারদীয়ার চতুর্থ সংখ্যা। আপনাদের সামনে নতুন নতুন লেখকদের লেখা প্রকাশ করার প্রচেষ্টাই হল আমাদের মূল অঙ্গীকার। আমরা মনে করি প্রত্যেক মানুষের এই পৃথিবীতে জন্ম হয় তাদের শৈল্পিক সত্তার মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বর তাদের মধ্যে কিছু না কিছু প্রতিভার বিকাশ ঘটান। শুধুমাত্র অভাব লক্ষ্য করা যায় একটি মঞ্চের। আমরা আশা করব আগামী দিনে আপনাদের “বই কুটির কলকাতা” হয়ে উঠবে অনেক উদীয়মান লেখক লেখিকা ও শিল্পীদের আত্মপ্রকাশের বিশ্ব মঞ্চ। বাংলা প্রকাশনী জগতে যুক্ত হবে এক নতুন পালক।

**

-: সম্পাদকীয় :-

প্রিয় বন্ধু,

মহামারী কবলে তৈরি হওয়া আমাদের এই ছোট্ট প্রচেষ্টাটি আজ অনেকের স্বপ্ন পূরণের মঞ্চে পরিণত হয়েছে। আজ প্রায় চার বছর ধরে আপনাদের আশীর্বাদ ও ভালোবাসায় প্রকাশ করতে পেরেছি আমাদের এই চতুর্থ বছরের "শারদ সংখ্যা ১৪৩১"। প্রতিকূলতার বাধা কম ছিল না, "বই কুটির কলকাতা" আজ এক এক করে সেই প্রতিকূলতাকে জয় করতে সক্ষম। যারা ভেবেছিল এটি শুধুমাত্র একটি অবসরের ইচ্ছে মাত্র, আজ সেইসব ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত করেছে "বই কুটির কলকাতার"। প্রথমে ফেসবুক পেজ, ওয়েবসাইট এরপর এক বিরাট সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছে "বই কুটির কলকাতা"। আপনাদের খুব খুশির সাথে জানাতে চাই আগামী কিছু মাসের মধ্যেই "বই কুটির কলকাতা" আত্মপ্রকাশ করবে এক প্রকাশনী সংস্থা হিসেবে এবং প্রকাশিত হবে বই। গত চার বছর যাবত অসংখ্য লেখক, লেখিকা ও চিত্রশিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছে "বই কুটির কলকাতার"। সেই সুবাদে তাদের অপ্রকাশিত লেখা প্রকাশ করেছে "বই কুটির কলকাতা" নিয়মিত। গত সংখ্যা গুলিতে যে সমস্ত লেখক, লেখিকা ও চিত্রশিল্পীরা আমাদের সাথে বিশ্বাসের স্বাক্ষর রেখেছেন তাদেরই ভরসা এবং ভালোবাসায় আমাদের এই পদক্ষেপ। সমস্ত প্রকার পরিকল্পনা চলছে এবং কিছু পরিকল্পনা ইতিমধ্যে সম্পন্ন। আর কিছু দূর এগোলেই পৌঁছে যাবো আমাদের স্বপ্নের দিকে।

শুধুমাত্র প্রকাশনী নয় "বই কুটির কলকাতা" ছড়িয়ে পড়বে তাদের নানাবিধ কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে নানান রূপে। তাই নতুন আঙ্গিকে আমাদের সকল দর্শক, চিত্রশিল্পী ও পাঠক, পাঠিকাদের কথা মাথায় রেখে "বই কুটির কলকাতার" এই নতুন আত্মপ্রকাশ। আবারও আমাদের সকল পাঠক, পাঠিকা ও চিত্রশিল্পী সহ যারা এই "বই কুটির কলকাতা"কে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন তাদের সবার প্রতি রইল আমার তরফ থেকে অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পাশে থাকবেন ও ভালোবাসবেন।

ধন্যবাদান্ত
সীমন্ত রায়
সম্পাদক

***

বই কুটির কলকাতা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ওয়েবসাইট পরিচালনায়

দৈতা দত্ত

প্রচ্ছদ অঙ্কন

জুনালী বেজ

শারদ সংখ্যায় ছবি গুলি উপহার দিয়েছে-

রীনা ব্যানার্জী
আরাত্রিকা বোস
অনুস্কা সাহা
সূর্য কুমার ঘোষ
সিদ্ধিক্সা বেজ
সময় সাহা
আদৃতা বেজ
ভূমিসিক্তা বেজ
সুপর্না কামাত

বই কুটির কলকাতা

সূচিপত্র

কবিতা

প্রিয় শরৎ
সুমধুর চক্রবর্তী

দুর্গোৎসব
জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি

আধুনিক জীবন
রবীন মুখার্জী

গল্প

নীল আলো
জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি

ঐতিহাসিক রচনা

কলকাতার বাবু কালচার
সীমন্ত রায়

অনুভূতি

অপেক্ষা
নার্গিস সুলতানা

ছোটো গল্প

বছর, সময় সত্যি কি আছে? এক টুকরো জীবনের পরিসরে
জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি

ভ্রমণ

সামাদেন
সম্রাট বসু রায়

রীনা ব্যানার্জী

নীল আলো.....

- জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি

জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসের শীত বেশ ভালোই পড়েছে, এই সময় গ্রামের ঠাণ্ডাটা বেশ ভালই পড়ে। গ্রামে কিছুদিনের জন্য ঘুরতে এসেছে প্রদীপ। পেশায় সাংবাদিক হওয়ার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেটের টান দিচ্ছিল সে। দূরে কোথাও প্যাঁচার কর্কশ ধ্বনি তার কানে এলো। হয়তোবা কোন শিয়াল ডেকে উঠেছে। এমনিতে গ্রামগঞ্জ শিয়াল ডাকা এমন কোন ব্যাপার নয়। তবে গা টা কেমন শিরশির করে উঠলো একটু যেন ছমছমে ভাব কোনদিন তো এরকম হয়নি কারণ এর আগেও সে অনেকবার এই গ্রামে এসেছে।

হঠাৎই সোজা তাকাতে দূরে বটগাছের একটু পাশেই একটা নীল তীক্ষ্ণ আলো তার চোখের দিকে ঠিকরে এলো। চোখটা যেন ধাঁধিয়ে গেল। আলোর দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলো এটা এলো কোথা থেকে? কে বা জালালো এত রাতে এত তীক্ষ্ণ আলো কিসেরই বা দরকার কিছুই তো বুঝতে পারছি না....? এতটাই মন দিয়ে সে দেখতে থাকলো, যে পাশে কখন রাম চাকর এসে দাঁড়িয়েছে সে খেয়াল করেনি।

'বাবু..... ' রামের গলা,

চমকে উঠল প্রদীপ।

'কিছু লাগবে বাবু, কি দেখছেন ওই দিকে' জিজ্ঞেস করল রাম ..... 'না না তেমন কিছু নয়। আচ্ছা রাম তুমি বলতে পারো ওই ওই ওই আলোটা কিসের....' বলল প্রদীপ।

'ওদিকে তাকাবেন না বাবু আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না..... ' । কাঁপা কাঁপা গলায় বলল রাম। 'কেন কি এমন জিনিস কি হয়েছে সেটা আমাকে খোলাখুলি বল তাকাবো না কেন আর মাথাই বা ঘামাবো না কেন কি হয়েছে বল....' প্রদীপের গলায় সন্দেহের সুর।

'না না বাবু ও আমি বলতে পারব না' এই বলে রাম কিরকম ভয়ে জড়সড়ো হয়ে ঘরের মধ্যে এক প্রকারে ছুটে পালিয়ে গেল। প্রদীপ মনে মনে বললো.....

যাই হোক অগত্যা এখন আর কিছু করার নেই কাল সকালে উঠে, আমাকেই কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে.....

ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না, ঘরে এসে দক্ষিণে জানলাটা খুলে দিল প্রদীপ কিরকম গরম লাগছে কিন্তু এখন তো শীতকাল। এইরকম হচ্ছে কেন?.... মাথায় কি সব যেন অদ্ভুত চিন্তা হচ্ছে এতদিন এখানে আসছি কোনদিন তো এইরকম আলো দেখিনি আর রাম কেনই বা আশ্চর্য রকম আচরণ করে চলে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না ও তো এরকম করে না। যাইহোক আজ অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ি। কাল সকালেই এই ব্যাপারে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। প্রদীপ ঘুমিয়ে পড়ল, কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানেনা? সারাদিনের যথেষ্ট ধকল হয়েছিল এখানে আসার পর থেকে অনেক কাজ ছিল কিন্তু এখন কটা বাজে? না ভোরতো হয়নি ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখে চারদিক নিস্তব্ধ নির্জন কিন্তু ঘরে পাখা চলছে না কেন?..... গ্রামেতে ইলেকট্রিক এসে গেছে এটা

অনেকদিন হয়ে গেল লোডশেডিং হয়ে গেছে বোধহয়। রামকে ডাকলো কোন উত্তর পেলো না, রাত অনেকটাই গাঢ় , সে শুয়ে পড়লো।

কখন ভোর হয়ে গেছে রামের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল, 'বাবু সকাল হয়ে গেছে, উঠবেন না আপনার জন্য চা জলখাবার করে রেখেছি খেয়ে নেবেন বাবু। আমি একটু বাজার করতে যাচ্ছি।'

প্রদীপ ওকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কিন্তু থেমে গেলো না দরকার নাই কালকে ও যা ভয় পেয়েছে দেখছে তারপর আর কোনরকম সাহস হলো না ওই আলোর ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে।

মুখ ধুয়ে জল খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ। গ্রামে কজন কে জিজ্ঞাসা করলো কেউ তেমন কিছু বলল না কেমন যেন এড়িয়ে যাচ্ছে যে কজনের থেকে জানতে পারলো ওটা একটা শ্মশানের ধারে একটা পোড়ো বাড়ির ধ্বংসস্তূপ আগে নাকি ওটাই জমিদার বাড়ির একটা অংশ ছিল। এখন বিশেষ কেউ সে দিকে যায় না তাছাড়া নীল আলো আসছে কোথা থেকে? সেটার উৎসই বা কি ? কে ওখানে আলো জ্বেলে সারারাত কি করে ? একবার না দেখলে?

আজ রাতে বোধহয় ঘুম হবে না?..... যাইহোক সারাদিন টুকটাক কাজকর্ম সেরে দুপুরবেলা কেটে যাবার পর সন্ধ্যা হতেই রাম কে বললো প্রদীপ

'এই রাম শোন আজ রাতে আমার একটু কাজ আছে। তুই বাড়ির দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিস আমার আসতে দেরি হবে'। 'কখন আসবেন বাবু' জিজ্ঞেস করল রাম চাকর.....

'ভোর হতে পারে বা একটু মাঝ রাতের দিকে চলে আসতে পারি'। 'কি কাজ আছে' রাম তাকে জিজ্ঞেস করল.....' তুই কি বুঝবি আমি সাংবাদিক মানুষ আমাকে এদিক সেদিক যেতে হয় তুই শুধু দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিস। আমি কাজ হলেই ফিরে আসবো।' এই বলে প্রদীপ হন্ হন্ করে বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল এক মুহূর্ত দেরি না করে হাতে একটা লন্ঠন আর একটা লাঠি নিল।এখানে রাত আটটা মানে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে বলতে পারা যায় অনেকটাই রাত হয়ে গেছে। গায়ে শালটা

ভালো করে জড়িয়ে নিল সে বেশ ভালোই ঠান্ডা পড়েছে। তার ওপর আজকে আবার হালকা হালকা মেঘ করেছে আকাশে, টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে। দূরের বটগাছটা ছাড়াতেই প্রদীপের গা টা কেমন ছমছম করে উঠল নিকষ কালো অন্ধকার। দুরে নীল আলোটা তীক্ষ্ণভাবে চোখের মধ্যে যেন তীরের ফলার মতো ফুটছে। একটু কাছে এগোতেই..... হর হর বোম বোম..... তালে.....কি ওই বৃদ্ধ প্রবীণ মানুষটি ঠিক কথাই বলেছিল কোন সন্ন্যাসী এখানে থাকে যে কিনা নরপিশাচ..... যাইহোক দেখতেই হবে সে নর পিশাচই হোক আর যেই হোক না কেন..... যতই এগোতে থাকলো প্রদীপ কাউকেই দেখতে পেলো না.... কিন্তু দূর থেকে কোথাও যেন একটা আওয়াজ আসছে

হর হর বোম বোম..... নীল আলোটা সুস্পষ্ট হচ্ছে যতই কাছে এগোচ্ছে প্রদীপ। বাড়ির অনেক কাছে চলে আসার পর যা দেখল তা আগে কখনোই সে দেখেনি। একটা ভাঙ্গা মত লোহার দরজা পরিত্যক্ত বিশাল আকার প্রকাণ্ড বাড়ি। প্রাসাদ বলা চলে। চারদিকে গাছ্ গজিয়ে গেছে, বাড়ি আর নেই বললেই হয়..... কোনমতে দরজা ঠেলে ঢুকলো সে..... একটা ভাঙ্গা ইট বেরনো দরজায় ফাঁক দিয়ে আলোটা এসে পড়ছে। প্রাসাদে প্রদীপ প্রবেশ করল। চারদিকে ঝোপঝাড় সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে খুব সাবধানে পা ফেলে ধীরে ধীরে সে এগোতে থাকলো। ভাঙা সিঁড়িবেয়ে কোনমতে উঠলো দোতলার বারান্দায় প্রকান্ড বারান্দা আলোটা আরো জোর। যে ঘরটা থেকে আলো আসছিল সেই ঘরের সামনে প্রদীপ যেতেই.....
কোথায় আলো এতো সম্পূর্ণ অন্ধকার শুধুমাত্র তার হাতের লন্ঠনটা জ্বলছে মাত্র। প্রদীপ যেই পেছন ঘুরল আবারো আলো দেখতে পেল আবার আরেকটা প্রকাণ্ড বারান্দা আর তার পাশেই একটা নীল আলো। এটা কি হচ্ছে? কিছুই বুঝতে পারলো না প্রদীপ। তার মাথা বন্ বন্ করে ঘুরছে। একটাই তো বারান্দা আবার আরেকটা বারান্দায় এলো কোথা থেকে? আলোটাই বা আসছে কোথা থেকে?

আর আলো তো এখানে ছিল না সে তো এখনই দেখল কোন আলো নেই তবুও সেই আলো আবার উল্টো দিক থেকে এলো কিভাবে আর তখন তো বাড়ির আলাদা কোন অংশও সে দেখতে পাইনি। একটা বাড়িতেই তো সে ঢুকেছে। আরো জেদ চেপে গেল প্রদীপের মাথায়। হাতের লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরল প্রদীপ, লন্ঠনের আলোটা একটু কমিয়ে দিল। হঠাৎই কেউ যেন ডাকল 'এই শোনো' 'শোনোনা একটু'..... প্রদীপ বেশ সাহসী হওয়া সত্বেও সে কেমন যেন কেঁপে উঠল একটা নারী কন্ঠ আবারো সেই ডাক 'এই শোনো'..... প্রদীপ মনে করলো হতেও তো পারে কোন নারী অথবা মেয়ে এই পোড়ো বাড়িতে হয়তো আটকে গেছে বা কোন বিপদে পড়েছে। সে ওই আলোটা অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে থাকলো। প্রদীপের মাথায় কাজ করছে না সে কেনই বা এই আলো অনুসরণ করছে সে কিরকম যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো আস্তে আস্তে আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দূরে কেউ বলে উঠলো..... হর হর বোম বোম....

প্রদীপের এতক্ষণ যে ভয়টা হচ্ছিল সেটা কেমন যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল...

সে একটা অমোঘ আকর্ষণে সেই নীল আলোটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো..... একটা সুন্দর ঘর সে দেখতে পেলে একদম সাজানো পরিপাটি, চারদিকে কাঁচের দেয়াল বাইজি ঘর অনেক নরনারী বসে আছে। কতজন গান গাইছে কতজন নাচছে অনেক বাবুরাও বসে আছেন। কেউ একজন প্রদীপকে বলল আসুন আসুন আরে আসুন না। বসুন বসুন দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন বসুন..... আরে একটু গান শুনুন....। আরে কে কোথায় আছিস

এই বাবুকে একটা ফরাস পেতে দে। প্রদীপ সেই ফরাসে বসে পড়ল..... চারদিকে গানের মুর্ছনায়..... বাইজি নাচের তালে ঝংকার উঠেছে প্রদীপকে কেউ একটা গড়গড়া এগিয়ে দিল। কিন্তু প্রদীপ লক্ষ্য করল গড়গড়ার পাইপ তার হাতে.... কিন্তু গড় গড়ায় কোন কল্কে নেই আগুন নেই কিন্তু ধোঁয়া উঠছে..... প্রদীপ কোন কিছু বুঝে ওঠার মত অবস্থায় নেই, পাইপে একটা টান দিল..... হঠাৎ সে দেখতে পেলো যে হাতটা তাকে গড় গড়ার পাইপ এগিয়ে দিয়েছিল সেটা একটা হাড় মাত্র। হাড়ে কয়েক জোড়া, লাল চুড়ি.....

বাবু একটা পান খাবেন.....

প্রদীপের মাথায় কোন কাজ করছে না তার গলা বুজে আসছে কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না..... সেই কুল কুল করে ঘামছে, কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে কিন্তু সে কিছুই বলতে পারছে না হাতের লাঠিটা যে কোথায় চলে গেছে সে জানে না লন্ঠনটাও বোধহয় নিবে গেছে। সবদিক প্রায় অন্ধকার সে চোখে অন্ধকার দেখছে নাকি ঘরটাই পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে নাকি সে কোথায় চলে এসেছে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। পাশ থেকে হঠাৎ সজোরে তার মাথায় কেউ একটা কিছু জোরে মারলো।

প্রদীপ স্পষ্ট শুনতে পেল কেউ একটা বলছে আমার রেশমি বাই কে তুই নিয়ে নিবি..... এটা হতে দেব না..... কেউ প্রদীপের গলাটা চেপে ধরেছে তার একফোঁটা নিঃশ্বাস নেওয়ার উপায় নেই.... কোন নারী কন্ঠ বলছে.... ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ও কিছু করেনি ওকে ছেড়ে দাও তারপরেই জোরে একটা আর্তনাদ..... একটা মহিলা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো প্রদীপের আর কিছুই মনে নেই.....

'বাবু বাবু আপনি ঠিক আছেন আমাকে চিনতে পারছেন আমি রাম.....'

প্রদীপের জ্ঞান ফিরেছে....

মাথার পিছন দিকটা খুব ব্যথা....

গ্রামের অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে.....

প্রদীপ পড়ে আছে একটা গাছ তলায় মাঠের মধ্যে.....

তার তেমন কিছু মনে পড়ছে না শুধু এইটুকুনি মনে পড়ছে কেউ একটা তার গলা চেপে ধরেছিল আর কেউ একটা তাকে পেছনে কিছু দিয়ে মেরেছিল....

একটা কথাই প্রদীপ সবাইকে জিজ্ঞেস করছিল যে ওই মেয়েটা কোথায়? যে তাকে বলেছিল 'শোনো না'.....

আর জিজ্ঞেস করছিল 'নীল আলোটা' এল কোথা থেকে.....

প্রদীপ দুদিন পর সুস্থ হয়ে উঠলো গ্রামের প্রবীণ ডাক্তার সুরেশ বাবুর যত্নে সে ভালো হয়ে উঠলে সুরেশ বাবু তাকে বললেন..... 'প্রদীপ তুমি খুব জোর বেঁচে গেছো তুমি কেন ওখানে গেছিলে বলতো গ্রামের লোক কেউ ওদিকটায়ে যায় না.....

প্রদীপ একটু সংকোচ করেই বলল জানেনই তো 'আমি পেশায় সাংবাদিক তাছাড়া ওই নীল আলোটা জন্যেই আমার যাওয়া নইলে আমার খুব একটা হয়তো আগ্রহ থাকতো না..... একটু বলবেন একটু অনুরোধ করছি....

ওই আলো টা কি বলুন তো? কেনইবা আমার সাথে এইরকম ঘটনা ঘটলো কিছুই তো বুঝতে পারছি না আর আমি হঠাৎ গাছ তলায় মাঠের মধ্যে পড়েছিলাম কেন..... আর একটা শব্দ হর হর বোম বোম ওটা কি বলুন তো?'

সুরেশ বাবু বলল.... ' আসলে তুমি যে জমিদারের বাড়িটা দেখেছো সেটা কোন বাড়ি আর নেই ওটা একটা ধ্বংসস্তূপই বলতে পারো।

অনেক বছর আগে চন্দ্র প্রতাপ নারায়ণ আর ভাই সূর্য প্রতাপ নারায়ণ দুজনেই এক বাইজির প্রেমে পড়ে জমিদার মানুষ তাই বাইজি টাকা-পয়সা কোনো কিছু ব্যাপারই নয়। তারা কোন কাজকর্ম করত না। শুধু বাইজি নাচ গান বাজনা নিয়ে ডুবে থাকতো..... কোন দিকে তাদের খেয়াল থাকত না প্রজাদের সঙ্গে তারা যথেষ্ট খারাপ ব্যবহার করত গ্রামে মানুষ এই নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল।

কোনভাবে চন্দ্র প্রতাপ নারায়ণ রেশমি বাইজির প্রেমে পড়ে এবং তার ভাই সূর্য প্রতাপ নারায়ণও রেশমি বাইয়ের প্রেমে পড়ে যায় এই নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে খুবই ঝগড়াঝাঁটি মারপিটের সৃষ্টি হয়। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না একদিন রাতে বাড়িতে নাচ গান চলার সময় প্রচুর মানুষ যখন জড়ো হয়েছিল সেই বাইজি ঘরে সেই সময় সূর্য প্রতাপ নারায়ণের সাথে রেশমি বাইয়ের ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত সহ্য করতে না পেরে চন্দ্র প্রতাপ নারায়ণ , সূর্য প্রতাপের মাথায় শক্ত একটা লাঠির বাড়ি মারে এবং সেই মুহূর্তে সূর্য প্রতাপ মারা যায়। রেশমিও কোনো মতে আটকানোর চেষ্টা করলে রেশমি কে গলা টিপে রাগের বসে তাকে হত্যা করে এবং লাঠির বাড়ি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে।

লোকমুখে শোনা যায় এরপর চন্দ্রপ্রতাপ পাগল হয়ে যায় এবং সে নরপিশাচ হয়ে যায় সেই বাড়িতেই সে বসবাস শুরু করে বাড়ি ভেঙে পড়ে তাদের জমিদারি শেষ হয়ে যায় সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। প্রতি রাতে সে তার ভাই সূর্য প্রতাপের গলা শুনতে পেত..... রেশমি বাই তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তার কাছে বারবার ফিরে আসতো এইরকম অনেক কথাই আমরা লোকমুখে শুনি। যদিও এখন ওই বাড়িতে কেউ থাকে না আর যে হর হর বোম বোম আওয়াজটারকথা তুমি বলছো সেটা লোকমুখে শোনা। সেরকম কোন আওয়াজ আমরা পাই না অনেকে বলে আওয়াজ আসে..... হর হর বোম বোম সেরকম কিছু প্রমাণ পাইনি।

কিন্তু আজও রেশমি বাইয়ের আত্মা ওই বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় আর সূর্য প্রতাপের আত্মাও সেই বাড়ি থেকে আজও চলে যায়নি।

আর পড়ে থাকলো তোমার নীল আলোর কথা। আসলে ওটা কোন নীল আলো নয়..... চন্দ্র প্রতাপ রেশমি বাইকে এতটাই ভালোবাসতো যে তাকে ভালোবেসে একটা নীলকান্ত মনি রত্ন

দিয়েছিল। সেই আলোই জ্বলজ্বল করে, এটা লোকমুখে শোনা, তুমিই বলো সেই রত্ন কি আজও থাকার কথা আর যদিও বা থাকে সেটা তো কিছু না কিছু ভাবে উদ্ধার করা যেতে পারত। অনেকেই সেখানে গেছে এই আলোর অনুসরণ করে কিন্তু কেউ ফিরে আসেনি। তোমার কপাল ভালো তুমি বেঁচে উঠেছ, ভগবান তোমায় রক্ষা করেছেন.....' এই বলে সুরেশ বাবু চলে গেলেন আর বলে গেলেন 'আর দয়া করে ওদিকে যেও না তুমি সাংবাদিক মানুষ আমি বুঝলাম। তাও বলছি, ওদিকে যেও না' এই বলে তিনি আবারো যাওয়ার সময় সাবধান করলেন। 'আর যেও না কিন্তু বলছি বড় একটা ভালো জায়গা নয়.....'

সেদিন রাতে প্রদীপ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

শরীরটাও তেমন একটা ভালো নেই।

আবার সেই আলো, সেই নীল আলো.....

হঠাৎ কেউ বলে উঠলো..... 'একটু শোনো'..... শোনোনা একটু'..... প্রদীপ পিছনে ফিরেতেই

আর্তনাদ করে উঠলো....

আলো.....

তীক্ষ্ণ নীল আলো.....।

সময় সাহা

প্রিয় শরৎ

-সুমধুর চক্রবর্তী

শরৎতের কাশফুল আনে মনে উৎসব,
দুঃখের রাত বুঝি শেষ-হল অনুভব।
অপরাজিতার আসা ধরণীতে আমাদের
অপরাজয়ের ধ্বনি মনে আসে মানুষের।
শরৎতের হিম দেখো আজকাল নেই আর,
প্রকৃতির কঠিনতা মনে আসে বারবার।
জাগ্রত চেতনায় জয় কর চারিদিক,
তোমারো ভূমিকা আছে এইদিক ঐদিক।
নবতর চেষ্টায় চল করি অভিযান,
ব্যর্থতা হবে দেখো ধূলিসাৎ-খান খান।
দশ বারে হয় নাকো মনের আশাপূরণ,
ষোলো বারে হইবেই সেগুলির জাগরণ।
সময়ের ফাঁক গুলি নাড়া দিও প্রাণপণ,
অপরাজিতার মত তুমি রবে অনুক্ষণ।

****

সুপর্ণা কামাত

কলকাতার বাবু কালচার
-সীমন্ত রায়

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরে এদেশের রাজা-বাদশা আর নবাবদের অন্তিম প্রহর শুরু হয়ে গিয়েছিল। রবার্ট ক্লাইভ এসে জাঁকিয়ে বসলেন কলকাতায়। বাংলা নতুন রাজধানী কোলকাতা, সিরাজ আগেই বাংলার বেশির ভাগটাই ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে গিয়েছিলেন ক্লাইভ তাই কলকাতাকে নতুন করে সাজানোর ব্যবস্থা করলেন। গড়ে উঠলো ইউরোপীয়দের জন্য হোয়াইট টাউন এবং দেশীয় প্রজাদের জন্য ব্ল্যাক টাউন। নেটিভ দের মধ্যে সেঠ, বসাকদের রমরমা তখন কলকাতায়। এছাড়াও উমিচাঁদ, জগৎসেট, ব্ল্যাক জমিদার গবিন্দরাম মিত্রর মতন বিত্তবানেরা ইংরেজদের পরম বন্ধু। সেই সময় কলকাতায় জন্ম নিল এক নতুন গোষ্ঠী, "কলিকাতার বাবু"। যাদের হাতে ছিল প্রচুর টাকা, সেই ভাবে ছিলনা কোন দায়ভার, তাই দুই হাতে বিড়ালের বিয়ে হোক, বাইজি নাচ বা পায়রা ওড়ানো সবেতেই তারা টাকা ওড়াতেন।

নতুন কলকাতা শহর দু ভাগে বিভক্ত ছিল। লালদীঘি থেকে শুরু করে চৌরঙ্গী অব্দি ছিলো সাহেবপাড়া বা হোয়াইট টাউন। বাকি পূর্ব-উত্তর ছিলো কালা অঞ্চল বা ব্ল্যাক টাউন। এই ব্ল্যাক টাউন সম্পর্কে প্রাইস বলছেন, ডক্টর রোনাল্ড মার্টিন লিখেছেন, "ভারতের সব শহরের ত্রুটিগুলি জড়ো হয়েছে এখানে, বাপরে একি বিশৃঙ্খলা, এলোপাথাড়ি বাড়ি, খানা, ডোবা, গলি হই হট্টগোল, কোনো রীতি নেই, শৃঙ্খলা নেই যেনো স্থায়ী গৃহ যুদ্ধ লেগেই আছে শহরে।"

ব্ল্যাক টাউনে দারিদ্র্য ছিলো নিরন্তর। কেউ সেখানে মারা গেলে শিয়াল ও শকুনই ছিলো ভরসা, সমস্ত সময় মসার গুঞ্জন আর মসাদের তাড়াতে ধোয়া। শরীর খারাপের একমাত্র ঔষধ তাবিজ। অলিতে গলিতে জুয়া। তবুও এত বিশৃঙ্খলার মধ্যে ব্ল্যাক টাউন জ্বলে উঠেছিল হাজার ঝাড়বাতির আলো, গড়ে ওঠে প্রাসাদ। অন্দরমহল, বৈঠকখানা, খাজাঞ্চিখানা, কোষাখানা আবার বাইজি নাচ। এই ব্ল্যাক টাউনেই জন্ম নেয় কলকাতার অহংকার বাবু সম্প্রদায়। সপ্তগ্রাম একসময় ছিল প্রধান বাণিজ্য বন্দর তবে সময়ের সাথে সপ্তগ্রাম তার নাব্যতা হারায়। তখন সেখানকার হিন্দু ব্যবসায়ীরা হুগলি পার হয়ে আরো দক্ষিণে সুতানুটিতে চলে এলো। সুতা আর কাপড় বিক্রি হতো এখানে, সুতানুটির হাট থেকেই ইউরোপীয় বণিকরা সুতা কিনে নিয়ে যেতেন, ইউরোপের বাজারে এই সুতার চাহিদা ছিল খুব। সুতানুটির আকাশে পয়সা উড়ছে আর সেই অর্থেই স্বাদ নিতে এই অঞ্চলে জনসংখ্যা বাড়তে শুরু করে। শোভারাম বসাকের সুতোর হাটে তখন রমরমা অবস্থা। গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে মুকুন্দরাম শেঠও চলে আসেন এই অঞ্চলে শেঠদের আদি পুরুষ ছিলেন বৈষ্ণবচরণ শেঠ। গঙ্গা জলে ব্যবসা ছিল তার সিলমোহর করে এই গঙ্গা জলের পাত্র যেত দেশে-বিদেশে। হোগলার বনে পড়ল কোপ-এই শেঠ-বসাকদের আড়ালে কিন্তু জঙ্গল কাটা বাসিন্দেও বলতো অনেক। আরো পরে শোভারাম বসাক কোম্পানির দালালি করেই বড়লোক হন। এভাবেই কলকাতার একটা আলাদা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, বাবু। এরা একে অন্যের বিরুদ্ধে আর্থিক ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। এক বাবু যদি তার বাবা-মায়ের শ্রাদ্ধে যদি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, তবে অন্য বাবু নিজের বিড়ালের বিয়েতে লক্ষ টাকার বাজি পোড়ান। কলকাতার সাথে বাবু কালচারের আত্মিকতা বোঝাতে তৈরি হয়েছিল একটি ছড়া। ছড়াটি এইরকম-

ধন্য হে কলিকাতা, ধন্য হে তুমি।

যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি।।

দিসি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলাতের চাল।

নকলে বাঙালি বাবু হলো যে কাঙাল।।

রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে।

ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়ে বাস করে।।...

তবে শুধু টাকা থাকলেই কিন্তু বাবু হওয়া যেত না। বাবু হতে গেলে অবশ্যই কয়েকটি গুণের অথবা পাপ গুণের অধিকারী হতে হবে, শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, বাবু মহাশয়রা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার-এসরাজ-বিনা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, ফুল আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রি কালে বারাঙ্গনাদিগের গৃহে গীত-বাদ্য ও আমদ-প্রমদ করিয়া কাল কাটাইতো এবং ঘরদ্বয়ের ঘোষপাড়ার মেলা এবং মাহেশের স্নানযাত্রায় প্রভৃতি সময় কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকের সঙ্গে লইয়া দলে দলে নৌকা যোগে আমদ করিতে যাইত। নব কৃষ্ণের ক্ষেত্রেই সাক্ষাৎ বাবু কথাটি ব্যবহার হচ্ছিল। নবকৃষ্ণের আগে ও সমসাময়িক প্রচুর অর্থবান মানুষ থাকলেও তাদের নামের আগে বাবু শব্দটি প্রচলন হয়নি। সেইকালের কয়েকজন বড়লোকদের নিয়ে একটি কথা প্রচলিত ছিল,

"বনমালী সরকারের বাড়ি

গোবিন্দ মিত্রের ছড়ি

নাক (নকু) ধরের করি

উমি চাঁদের দাড়ি।"

এই ছড়ার ভিন্ন পাঠও আছে। সেখানে বনমালী সরকারের জায়গায় মথুর সেনের বাড়ি আর গোবিন্দরাম মিত্রের জায়গায় নন্দরামের নাম উচ্চারিত হতো। নন্দরাম সেন ও গোবিন্দরাম দুজনেই ছিলেন ব্ল্যাক জমিদার। কলকাতার প্রথম ব্ল্যাক জমিদার হলেন নন্দ রাম, ইনি ছিলেন খুবই প্রতাপশালী একজন ব্যক্তি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই নন্দ রাম কে তহবিল তচরুপের দায় চাপিয়ে, তাকে সরিয়ে জগৎ দাস নামে একজনকে এই পদ দেওয়া হয়। তবে আবার স্ব মহিমায় ফিরে আসেন এই নন্দ রাম। তবে একটা সময় নন্দনাম কে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন গোবিন্দরাম মিত্র। কুমোরটুলিতে বানালেন উঁচু বাড়ি ও ১৬৫ ফুট উঁচু নবরত্নের মন্দির যা ১৭২৭ সালে তৈরি হয়। তবে ১৭৩৭ সালে ভয়ঙ্কর এক ঘূর্ণিঝড়ে সেটি ভেঙে যায়। আর ১৮৪০ সালের ভূমিকম্পে সেটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। সাহেবরা এর নামকরণ করেছিল ব্ল্যাক প্যাগোডা।

এরপর আসেন লুকৃধর আসল না লক্ষীকান্ত ধর। কলকাতার পোস্তার কাছে লুকৃধরের রাজ্যপাট, বিপদে পড়লে কোম্পানি অবদিও হাত পাততো লুকৃধর কাছে। রবার্ট ক্লাইভকে অবদিও তখনকার দিনে ন'লক্ষ টাকা ধার দিয়েছিলেন, বিনিময় পেয়েছে না অনেক। এই লুকৃধরের মত ধনকুবের তখন কলকাতায় আর কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। এরা সবাই ধনকুবের হলেও বাবুয়ানি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুরু করেন নবকৃষ্ণ। পলাশী যুদ্ধের জয় কে ভাগ করে নিতে নবকৃষ্ণ নিজের শোভাবাজার বাড়িতে প্রচলন করলেন দুর্গাপূজার। এই পোড়া দেশে ইংরেজদের আনন্দ উপভোগ করার মত উপকরণ কিছুই ছিল না। নবকৃষ্ণ ইংরেজ ভজনের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে জাঁকজমক করে শুরু করলেন দুর্গাপূজা। ক্লাইভ খুশি হয়ে নবকৃষ্ণ কে দান করেন রাজা উপাধি। এই সময় বড় বড় পণ্ডিতদেরও বাবুরা টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন, সমাচার দর্পণে তখনকার দিনে এই নিয়ে একটা রসিকতা ছাপা হয়,

“বাবু : ভট্টাচার্য মহাশয় সুরাপানে কি পাপ হয়?

ভট্টাচার্য: ইহাতে পাপ হয় যে বলে, তাহার পাপ হয়। মদ্য ব্যতিরেকে উপাসনাই হয় না। বলরাম ঠাকুরও মদ্যপান করিয়াছিলেন।”

বাবু তুষ্ট হইয়া ভট্টাচার্য মশাই কে টোল খুলে দিলেন।

বাবু লক্ষণ দু'রকমের এক ধরনের লক্ষণকে বলা যেতে পারে “শাস্ত্রীয়” অন্যটি “লৌকিক”। লৌকিক লক্ষণ গুলির মধ্যে অগ্রগণ্য বাবুর চেহারা। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ এমনকি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হলেও অসুবিধা নেই, তার চেয়েও বড় জরুরী চেহারাখানা বেশ চটকদার হওয়া উচিত। সেই তৈল চিকন দেহটির মেদের ঠিক ঠিকানা থাকলে হবে না। প্রকৃত বাবুর উদরের সঙ্গে পদযুগলের ও দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থের পুরোপুরি অসামঞ্জস্য থাকা চাই। দ্বিতীয়ত তার বাক্য বা পোষাক এমন হওয়া চাই যাতে অনায়াসে বাঙ্গালীদের থেকে তাকে বেছে নেওয়া যায়। এই বাবুরা ধুতি-চাদর পড়তে পারেন কিন্তু সেই ধুতি যেন ঢাকাই ধুতি হয় এবং তার জরির পারখানা যেন কোমরে চোট দিতে না পারে। এই বাবু সবসময় তার একদিকের পাড় ছিড়ে পড়বেন এবং তার পক্ষে কোঁচা সবসময় উড়েকোঁচা হবে, নয়তো ত্রীকচ্ছপ। যদি তিনি ইচ্ছে করেন তবে তিনি মোজা ওয়াকিং স্যুশ পড়তে পারে কিন্তু কদাপি এমতাবস্থায় তিনি যেন সুস্থ বাংলা বা ইংরেজি না বলে। প্রকৃত বাবু হলেও তা বলে না। বাবুরা ঘুড়ি ওড়ানো, আখড়া সাজানো এবং বুলবুলির লড়াই এইসবে পেছনে অঢেল টাকা খরচা করতেন। তবে সব থেকে বেশি করতেন খ্যাতির পিছনে। বাবুদের খ্যাতি চাই যে কোন মূল্যে। এসবের অন্যতম ছিলেন রায়বে মহারাজ রাজবল্লভ। ছিলেন চরকডাঙ্গা এখনকার দিনের নতুন বাজারের কাছে মহারাজ নন্দকুমারের ছেলে রাজা গুরুদাস, ছিলেন পাথুরিয়া ঘাটার মল্লিক ও ঠাকুর, বড় বাজারের গৌরী সেন, সিমলাতে রাম দুলাল দে, কুমোরটুলিতে মিত্র রায়, শ্যামবাজারের দেওয়ান কৃষ্ণ রাম বসু প্রতিষ্ঠা করেন বসু বংশ, কলুতলায় মতিলাল শিলের প্রতিষ্ঠিত শীল বংশ, ঠনঠনিয়ায় ঘোষ, দর্জিপাড়ায় মিত্র, জানবাজারে প্রীতরাম মার বা রানী রাসমনির বংশ, কিন্তু তখনকার কলকাতায় এই বাবু তকমা পেয়েছিলেন মোটে আটজন। এই আট বাবুই শাসন করতেন কোটা কলকাতা।

এদের শিরোমনি রামতনু দত্ত, লোকে বলতেন বাবু তো বাবু তনু বাবু। এছাড়া ছিলেন নীলমনি হালদার, গোকুল চন্দ্র মিত্র, রাজা নব কৃষ্ণের ছেলে রাজা রাজকৃষ্ণ, কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ ছাতুসিংহ, ঠাকুর বংশের পূর্বপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর, নকুধরের দৌহিত্র সুখময় রায় আর চোর বাগানের মিত্র। ১৮২৭ সাল নাগাদ চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদার একটা অদ্ভুত কান্ড করে বসলেন, তিনি জিন্সুরাতে বসে কোম্পানির কাগজে চুরুট ধরালেন, দেখতে দেখতে খ্যাতি রটে গেল। প্রাণকৃষ্ণ হলেন নবম বাবু। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সমস্ত কলকাতাকে ধর্ম নির্বিশেষে নিমন্ত্রণ করলেন তার দুর্গা পুজোতে। অবশেষে জালিয়াতির অপরাধে তার কারাবাস হয়। তবে এই বাবু কালচার কিন্তু খুব বেশি দিন ছিল না কলকাতায়। মাত্র ১০০ বছরের মধ্যেই বাবু কালচারের অধোগতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে তাদের খ্যাতি ও টাকা কমতে থাকে। অন্যদিকে সরি কি মামলা ও মকদ্দমায় এই বাবুদের যৌলুস কমতে বেশি সময় লাগেনি। শুধু কলকাতার বুকে আজও রয়ে গিয়েছে তাদের স্মৃতিটুকু।

•তথ্য সংগ্রহ স্যোশাল মিডিয়া

সূর্য কুমার ঘোষ

অপেক্ষা
নার্গিস সুলতানা

পরের বছর শীতে স্কটল্যান্ড থেকে ফিরব বলেছিলো রনি। কিন্তু দেখতে দেখতে চার বছর হয়ে গেলা ছোটো বেলায় রনির পাটিগণিত না মিললে খুব চিন্তায় থাকতেন রমেশ বাবু। সেদিনের অঙ্কটা মিলে যাওয়ার অপেক্ষার থেকে আজ ছেলের কলকাতায় ফিরে আসার অপেক্ষাটা অনেক বেশী যন্ত্রণা দেয়, তবুও আজ শুধু এই অপেক্ষাতেই রমেশ বাবুর দিন কাটে।

****

ভূমিসিক্তা বেজ

আধুনিক জীবন

- রবীন মুখার্জী

১১/০৭/২০২৪

গত তিন দশকে মোদের জীবনে ঘটেছে অনেক কিছু
হয়েছে ভালো অনেক কিছু, মন্দ হয়েছেও বেশ কিছু।
হাতের মুঠোয় ধরা এক যন্ত্র নাম মোবাইল ফোন
সবকিছু ভুলে আমরা সবাই তাকেই দিয়েছি মন।

শয্যা সঙ্গী করেছি তাকে, চোখে হারাই নাতো কভু
তার কাছে মোরা হয়েছি যে দাস, হয়েছে মোদের প্রভু।
চিঠি পত্র, লেখা লেখি মোরা, গিয়েছি সবাই ভুলে
যেটুকু আজ যোগাযোগ করি, হোয়াটসঅ্যাপ আর মেলে।

বাজারে গিয়ে কেনাকাটা আজ কজনে ই বা করে
অ্যামাজন বা ফ্লীপকার্ডে তে অর্ডার টা দেয় ভরে।
মনের জিনিস আসবে তোমার বেল বাজিয়ে ঘরে
লোকে বলে এই কেনা কাটায়, সস্তা নাকি পড়ে।

শহর ও শহরতলি তে ছিল, কত না সিনেমা হল
কালের নিয়মে হয়েছে বলি, এসেছে নতুন মল
সিনেমা দেখার টিকিট কাটায়, এখন হয় না হুড়োহুড়ি
বুক-মাই শোতে অনলাইনে সবাই, টিকিট টা বুক করি।

প্রত্যেক পাড়ায় ছিল ক্লাব ঘর, ছিল যে খেলার মাঠ
পাড়ার প্রবীণেরা নবীন প্রজন্ম দের দিত জীবনের পাঠ।
একে অপরের বিপদের দিনে থাকতো সবাই পাশে
একথা শুনে আজকের মানুষ, কেবল মুচকি হাসে।

আজকে আমরা হয়েছি আধুনিক, ভালো হয়েছে জীবনযাত্রা
তবু, হারিয়ে ফেলেছি মনের বিশ্বাস, একে অপরের আস্থা।
সমাজে থেকে ও দিনে দিনে মোরা, হচ্ছি অসামাজিক জীব
এই জীবন কে বলবো কি মোরা, আধুনিক না ক্লীব?

****

সিদ্ধিক্সা বেজ

বছর সময় সত্যি কি আছে? এক টুকরো জীবনের পরিসরে....

- জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি।

বছরকে জানাই বিদায় বছরকে করি আহ্বান। সত্যি কি বছরকে আমরা বিদায় জানাই না সময়কে ঘড়ির কাঁটার সাথে মিলাতে পারি? সত্যি কি আমরা বছরকে আমাদের জীবনের সাথে ধরে রাখতে পারি? নাকি মেপে নেওয়া এক টুকরো সময়কে বলি বছর। যা ৩৬৫ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ বারোটা মাসেই জীবন আটকে থাকে নিয়মের সময় বাধা মানে না। মানে না কোন বেড়াজাল।

তবু এই আদি অন্ত থেকে প্রবাহমান সময়ের স্রোতকে আমরা বছরে আটকে দিই। বছরের যেমন কোন সময় থাকে না সময়ের কোন বছর থাকে না তবুও মান ও হুঁশের হাতে সময় আটকে পড়ে সত্যি কি সময় কে আমরা আটকে রাখতে পারি?

নাকি বছরের তকমা দিয়ে জীবনের আয়ু-কাল মাপি মনুষ্যসমাজ নিয়ম-নীতি তৈরি করে, আর ভাবে 'সময়কে করেছি বন্দি।'

ভাবি ঘণ্টা মিনিট সেকেন্ড এর ব্যবধান মাত্র পৃথিবীর নিয়ম সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় চলে মানুষ ভাবে সময় তার সৃষ্টি, আসলে সময় বলতে কিছু হয়? নাকি জীবনকে চালাতে আমরা নাম দিই সময়। নাম দিই বছর। আবিষ্কার করি ঘড়ি। যা টিক্ টিক্ করে জানান দেয়, ওঠো চলো আর দেরি নেই বেশি দিনের জন্ম ক্ষণে ঘড়ির সময় মাপি। মৃত্যু ও ঘড়ি সময় মাপে। সৃষ্টিকর্তার এক এক পলক হাজার হাজার বছর কে পার করে দেয়।

নদীর স্রোতের সাথে সময়কে তুলনা করি নিজ জীবনের স্বার্থে বছর ও সময়কে তুলনা। এক এক নামের মাধ্যমে উপস্থাপিত করি মহাকালে চলে যাই আমরা সূর্য উদয় থেকে অস্ত অথবা দিন থেকে রাতটিকে সময় ধরি । বারোটা মাসকে ধরি বছর। মহাকাল হাসেন আড়াল থেকে।

"আমি এনেছি রঙ্গমঞ্চে খেলা শেষে ফিরবি আমারই কোলে।"

তার এই লীলা খেলা বোঝা কার সাধ্যি তবু বছর সময় আনাগোনা চলতে থাকে নিয়ম করে মানুষ আর মানুষই নিয়মের শৃঙ্খলে ধরা পড়ে যায়।

মানুষ বাঁচতে চায় জীবন কিন্তু ছোট। জীবন ছোটে তার গন্তব্যে সময় মেপে দেয় জীবনকে।

তাই জীবন বলে.....

আলোর পরে অন্ধকার
অন্ধকারে আলো।
বছর শুরুর ডাকে, বছর শেষ হল।
সময় আসে সময় যায়
থামে কোলাহল।
বাঁচে না বছর, বাঁচেনা সময়,
তবু ফিরে চল।
সৃষ্টিকর্তা হাসে।
জন্ম হলে মৃত্যু হবে।
বছর ঘুরে আসে।
নিয়ম ভাঙে সময়,
'বিশ্বাসে' মানুষ বাঁচে।।

****

আদৃতা বেজ

ভ্রমণ – সামাদেন

- সম্রাট বসু রায়

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কোন মতে তৈরি হয়ে চলে যাই কর্মস্থলে। কর্পোরেট জীবন তাই নিঃশ্বাস ফেলা সময়টুকুও থাকে না। তাই অবসর সময় খুঁজে বেড়াই ক্যালেন্ডারের লাল দাগ গুলো। কোনোমতে লালের আশেপাশে কালো দাগ গুলোকে লাল বানিয়ে সুযোগ বুঝে ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পরি প্রকৃতির নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য।

আজ যেই জায়গাটার কথা আমি বলবো সেটি মানব চোখের আড়ালে এক অপূর্ব ভ্রমণ স্থল। কোন সময় একা একাই আমি চলে গিয়েছি এই প্রকৃতির কোলে। মোটামুটি হাতে পাঁচ দিনের মতন সময় থাকলেই বেরিয়ে আসা যেতে পারে এই জায়গাটি। নাম সামাদেন।

পর্বত বেষ্টিত এই অঞ্চলটি আধুনিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে কিঞ্চিৎ বঞ্চিত। তাই হাতের সেলফোনের নেটওয়ার্কের চিন্তাভাবনা না থাকলে আপনি অনায়াসেই ঘুরে আসতে পারেন এই জায়গাটি। চারিদিকে পর্বত এবং জায়গাটি নিজেই একটি মাথা কাটা পর্বতের উপর বেষ্ঠন করে গড়ে উঠেছে একটি ছোট্ট গ্রাম। ইংরেজিতে যাকে বলে টেবিল টপ। দূর থেকে এই জায়গাটি দেখলে মনে হবে কোন এক অমানবিক শক্তি নিখুঁতভাবে একটি পাহাড়ের চূড়াটি কেঁটে এই জায়গাটি তৈরি করেছে এবং সেখানে গড়ে উঠেছে কিছু বসতি। মনোরম পরিবেশ এবং প্রকৃতির নির্যাস পেতে আমি বারবার ছুটে যাই এই জায়গায়। মোট ছয় বার গিয়েছি এই জায়গাতে।

কলকাতা, শিয়ালদা বা হাওড়া থেকে ট্রেনে করে চলে যেতে হবে নিউ জলপাইগুড়ি। এখান থেকে দুই ভাবে যাওয়া যেতে পারে আমাদের গন্তব্যস্থল সামাদেন। প্রথমটি, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি হয়ে জোড়থাং, এবং সেখান থেকে ভারেং। প্রথম দিনটা থাকলে ভালো হয় এই ভারেং-এ। দ্বিতীয় দিনে আমাদের আর কোন গাড়ির প্রয়োজন হবে না। তাই ভারেং থেকেই আমরা রওনা দেবো সবুজ প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে গোর্খের উদ্দেশ্যে এবং সেখান থেকে সামাদেন, যার দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার। একটু কষ্ট হলেও পাহাড়ি অঞ্চলে এই ছোট্ট ট্রাকিং পথটি খুবই আকর্ষণীয় এবং সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।

অন্য আরেকটি পথে যাওয়া যেতে পারে এই গন্তব্যস্থলে। তারজন্য প্রথমদিন শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি ভাড়া করে আমরা রওনা দেবো শ্রীখোলা, এবং সেখান থেকে সেইদিনের রাতটা কাটিয়ে দ্বিতীয় দিন ট্রেকিং পথ দিয়ে হেঁটে পৌঁছাবো সেই টেবিল টপ সামাদেন, এই পথটির দূরত্ব আনুমানিক ১৫ কিলোমিটারের মত।

অপূর্ব সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এই ছোট্ট গ্রামটিকে দেখলে আপনি তার প্রেমে পড়ে যেতে বাধ্য। চারিদিকে সবুজে ঘেরা বনানী এবং পাহাড়ের কোলে অবস্থিত একটি নির্জন পরিবেশ যা আপনাকে মানসিক শান্তিতে পরিপূর্ণ করে রাখবে। উল্লেখিত এই গ্রামে মোটামুটি 5 টির মত হোম-স্টে আছে এবং গোর্খে অঞ্চলে রয়েছে 15 টির বেশি হোম-স্টে। যার মাথাপিছু ভাঁড়া প্রায় 1000 টাকা থেকে 1200 টাকা প্রতি দিন।

এবার একটু আলোচনা করা যাক মোট খরচের ব্যাপারে। থাকার ব্যাপারে আপনাদের আমি আগেই বলেছি, এবার বলা যাক গাড়ি ভাড়ার সম্বন্ধে কিছু খরচ। শিলিগুড়ি থেকে জোড়থাং যেতে আনুমানিক খরচ পড়তে পারে 3500 টাকা এবং সেখান থেকে ভারেং যেতে লাগবে 4000 টাকার মতো। অন্যদিকে শিলিগুড়ি থেকে শ্রীখোলা যেতে গাড়ি ভাড়া লাগতে পারে আনুমানিক 6000 টাকা। তবেই বুঝতে পারছেন যদি একটি গ্রুপ করে যাওয়া যায় তবে সেই খরচ গুলি অনেকটাই ভাগাভাগি হয়ে যাওয়া সম্ভাবনা থাকে। সবশেষে এটা বলাবাহুল্য যে এই জায়গায় বছরের সমস্ত সময় আশা যেতে পারলেও বিশেষ করে অক্টোবর থেকে মার্চ মাস খুবই উপযুক্ত সময়।

****

দুর্গোৎসব

জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি

বাতাসে আজ পুজোর গন্ধ
মনটা চঞ্চল।
আকাশে সাদা পুঞ্জ মেঘের মেলা
মনটা বলে, মা আসছে
সবাই মিলে ঠাকুর দেখবি চল।
বাদ্যি বাজে শঙ্খ বাজে
স্বর্গ হতে মর্ত্য লোকে
আনন্দ কোলাহল।
কাশ ফুলেতে মাঠ জুড়েছে,
সাজো সাজো রব।
প্যান্ডেলেতে জমবে মজা,
বাঙালির দুর্গোৎসব।

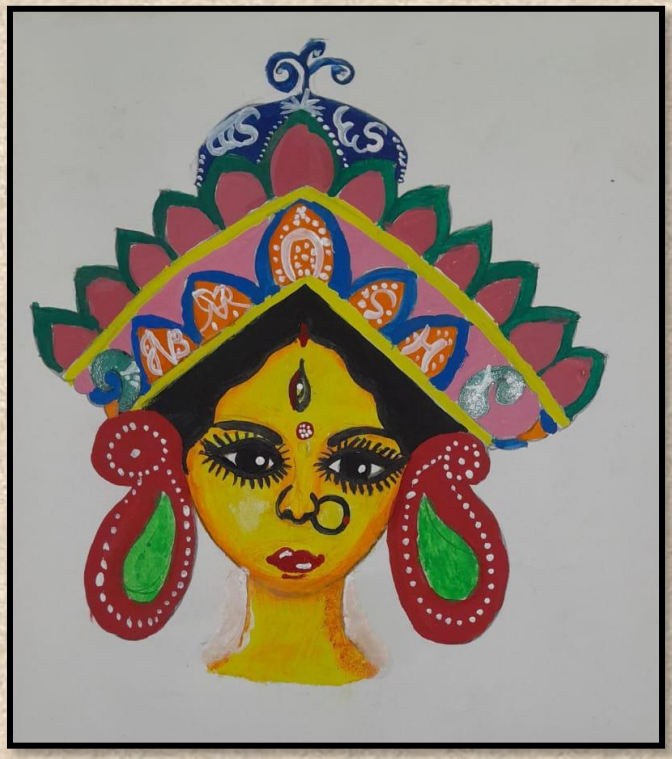

অনুস্কা সাহা

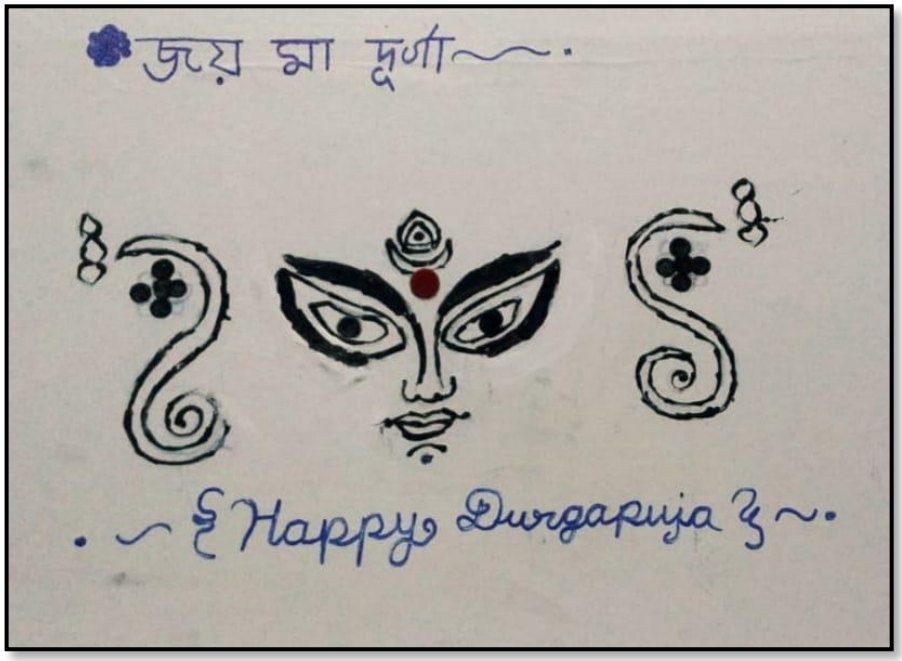

আরাত্রিকা বোস

বই কুটির

কলকাতা

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন
গ্রহণ করুন

+91- 9903129991|
boikutirkolkata@gmail.com
https://www.facebook.com/Boi-kutir-kolkata-বই-কুটির-কলকাতা-123508622632570/
https://www.boikutirkolkata.co.in
https://www.instagram.com/Boi_Kutir_Kolkata/